ভ্যাক্সিন কীভাবে কাজ করে?

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

আমাদের চারপাশ জীবাণুতে ভর্তি। চাইকি আমাদের পরিবেশ বা আমাদের শরীর। ক্ষতিকর জীবাণুর আঘাতে আমরা রোগাক্রান্ত বা এমনকি মারাও যেতে পারি।

কিন্তু শরীরও ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়। আত্মরক্ষার জন্যে এর রয়েছে সুনিপুণ কৌশল। রোগ সৃষ্টিকারী প্যাথোজেনকে সুকৌশলে প্রতিহত করে দেহের ইমিউন সিস্টেম বা রোগপ্রতিরোধব্যবস্থা ব্যবস্থা। এ প্রতিরোধ হয় দুইভাবে। প্রথমে চেষ্টা থাকে জীবাণু যাতে শরীরের প্রবেশই করতে না পারে। সেজন্য ত্বক, মিউকাস বা সিলিয়া (ফুসফুস থেকে ধুলোবালি সরানোর বিশেষ অঙ্গ, যাকে খালি চোখে দেখাও যায় না) প্যাথোজেনদের শরীরের প্রবেশ করতে বাধা দেয়। এ তো গেল প্রাথমিক প্রতিরোধ। কিন্তু কোনো কোনো দুষ্ট প্যাথোজেন এ বাধা মাড়িয়েও শরীরের প্রবেশ করে ফেলতে পারে। তাদের জন্যেও রয়েছে ব্যবস্থা। রোগপ্রতিরোধব্যবস্থা জীবাণুটিকে পরাজিত বা মেরে ফেলতে চেষ্টা করে।

কাজটা কীভাবে হয় জানতে প্যাথোজেন সম্পর্কে আরেকটু জানা লাগবে। জানতে হবে প্যাথোজেন হতে পারে কারা কারা। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক বা পরজীবীরা প্যাথোজেন বা ক্ষতিকর জীবাণু হিসেবে কাজ করে। প্রতিটি প্যাথোজেন আলাদা আলাদা উপাদান নিয়ে গঠিত। রোগ বা ধরনভেদে সাধারণত এরা একেবারেই ভিন্ন হয়। প্যাথোজেনের কোনো একটি অংশের প্রভাবে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বুঝে ফেলে শত্রু হানা দিয়েছে ঘরে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তখন এর বিরুদ্ধে কাজ করা শুরু করে। তৈরি হয় অ্যান্টিবডি। প্যাথোজেনের যে অংশের প্রভাবে দেহে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় তার নাম অ্যান্টিজেন।

প্যাথোজেনের অ্যান্টিজেনের প্রতিক্রিয়ায় দেহে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডি ইমিউন সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অ্যান্টিবডিকে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সৈন্য বলতে পারো। প্রতিটি সৈন্যই একটি নির্দিষ্ট ধরনের অ্যান্টিজেনকে চিহ্নিত করার প্রশিক্ষণ পায়। আমাদের শরীরে আছে হাজার হাজার আলাদা অ্যান্টিবডি। শরীরের নতুন কোনো অ্যান্টিজেনে আসলে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা তার বিপরীতে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সময় নেয় একটু। আর এই সময়েই আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি।

অ্যান্টিবডি প্রস্তুত হয়ে গেলেই সেটি প্রতিরক্ষাব্যবস্থার বাকি অংশের সাথে একাত্ম হয়ে প্যাথোজেন ধ্বংসের কাজে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। সাধারণত এক প্যাথোজেনের জন্যে তৈরি অ্যান্টিবডি অন্য রোগের সাথে লড়তে পারে না। যদি না দুই প্যাথোজেন খুব কাছাকাছি ধরনের হয়। শরীর শুধু অ্যান্টিবডি তৈরি করেই বসে থাকে না, আরও তৈরি করে অ্যান্টিবডি প্রস্তুতকারী মেমোরি সেল বা স্মৃতি কোষ। অ্যান্টিবডি প্যাথোজেনকে নির্মুল করে ফেললেও এই কোষ সক্রিয় থাকে। আগের শত্রু আবারও দূর্গে হানা দিলে অ্যান্টিবডি এবার খুব দ্রুত হামলার জবাব দেয়। তাও খুব শক্তভাবে। কারণ স্মৃতি কোষ জানে কীভাবে শত্রুকে ঘায়েল করতে হবে।

তার মানে ভবিষ্যতে একই শত্রুর মুখোমুখি হলে প্রতিরোধব্যবস্থা সাথে সাথে কাজ করবে। মোকাবেলা করবে রোগকে।

**এখন ভ্যাক্সিন বা টিকা কীভাবে কাজ করে?** টিকায় থাকে একটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের দুর্বল বা নিষ্ক্রিয় অংশ। এটি ইমিউন সিস্টেমকে সক্রিয় করে তোলে। টিকায় অ্যান্টিজেন থাকে না। থাকে অ্যান্টিজেন তৈরির ব্লুপ্রিন্ট বা নীলনকশা। এই ব্লুপ্রিন্ট রোগ তৈরি করবে না। কিন্তু যখন সত্যিকার রোগে দেহ আক্রান্ত হবে তখন খুব দ্রুত রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়বে। কোভিড-১৯ এর অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকায় রয়েছে অ্যাডিনোভাইরাসের পরিবর্তিত রূপ।

কোনো কোনো টিকায় একের বেশি ডোজ দরকার হয়। মাঝে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের বিরতি হতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী অ্যান্টিবডি ও মেমোরি সেল তৈরির জন্য লাগে এ সময়। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট ধরনের রোগকে প্রতিহত করার প্রশিক্ষণ পায় শরীর।

হার্ড ইমিউনিটি কী?

ইংরেজি শব্দটা হলো herd immunity, hard বা শক্ত নয়। হার্ড ইমিউনিটি হলো রোগের বিরুদ্ধে গৌষ্ঠিক নিরাপত্তা। টিকা নিলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আর খুব বেশি থাকে না। কিন্তু সব মানুষ তো আর টিকা নিতে পারে না। ক্যান্সার বা এইডস দেহের ইমিউন সিস্টেমকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। আবার টিকার কোনো কোনো অংশের প্রতি অনেকের অ্যালার্জি থাকতে পারে। টিকা না নেওয়া এই মানুষগুলোও নিরাপদ থাকতে পারেন, যদি তারা বাস করেন একদল টিকা নেওয়া মানুষের মাঝে। একটি এলাকার বেশিরভাগ মানুষ টিকা নিয়ে ফেললে রোগের জীবাণু আর সহজে ছড়াতে পারে না। ফলে যত বেশি মানুষ টিকার আওতায় আসবেন, ততই টিকা না নেওয়া মানুষের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে আসবে। একেই বলে হার্ড ইমিউনিটি।

সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-do-vaccines-work